মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা-চরিত': কতিপয় দিক মূল্যায়ন

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী*

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে রচিত সীরাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। ইহা বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যুক্তিভিত্তিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত একটি জীবন-চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থ। তথ্য এবং প্রাচুর্যের দিক থেকেও ইহা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থকে তিনি দুভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি উপক্রমণিকা ভাগ এবং অন্যটি ইতিহাস ভাগ। উপক্রমণিকাতে 'মোস্তফা চরিত' এর উপকরণের তিনটি সূত্র, হাদীস সম্বন্ধে বিভিন্ন মূল্যায়নধর্মী আলোচনাসহ মোট ১৪টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এর ইতিহাস ভাগ তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণাত্মক। এ অংশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্ম থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে মোট ৭৯টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি নবী-চরিত সম্পর্কীয় প্রচলিত বহুতথ্য ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছেন। সাথে সাথে জমহুর ওলামা কর্তৃক বর্ণিত বহু বর্ণনা ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করেছেন। ফলে 'মোস্তফা-চরিত' এর বহু মতামত আলেম সমাজ তথা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' কর্তৃক গৃহীত হয়নি।

মাওলানা আকরম খাঁর বক্তব্য হতে জানা যায় যে, ইসলাম ও মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে যেসব কথা, আজগুবী গল্পগুজব আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এখনও রয়েছে, সাধারণভাবে লিখিত গ্রন্থসমূহে এবং নবী-জীবনী গ্রন্থসমূহে সেসব আজগুবী উপকথা স্থান লাভ করেছে। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর এ গ্রন্থে এসব ভ্রান্ত মত ও যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি ছিলেন অন্ধ অনুকরণের দুশমন এবং ইজতিহাদের প্রবক্তা। তবে তিনি ভুল-ত্রুটি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন এবং তাঁর 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থটিও সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং ষোল-কলায় পরিপূর্ণ এ কথা বলার সুযোগ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধখানা রচনা করেছেন এবং 'মোস্তফা-চরিত' এর কতিপয় দিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পরে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং চাকুরির ক্ষেত্রে উপমহাদেশ বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানগণ অনেক পিছিয়ে পড়ে। এই অধঃপতিত সমাজের গতিপথ নির্ণয়ে ও সহায়তায় যাঁরা ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নেতৃত্বে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রীঃ) ছিলেন অন্যতম। শতাব্দীকাল

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যাবৎ তিনি নিজ সাধনা ও শ্রমে বাংলা ভাষায় মুসলিম জাতীয় চিন্তাধারার অবকাঠামো গঠন করেছেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ইসলামী রচনার পুরোধা। মাওলানা আকরম খাঁ জীবনের গোড়া থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। সে জন্যই তিনি যুক্তিনির্ভর বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তিনি ছিলেন 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়ভুক্ত 'লা-মাযহাবী' পন্ডিত এবং অনেক সময় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতকেও বর্জন ও দুর্বল করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকে আরো মজবুত করার মানসে সর্বদা চিন্তা করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে জাতির বিবেক পত্র-পত্রিকাগুলোকে সংস্কারের চিন্তা করেন।[১] মুসলিম সমাজ ও জাতি বিশেষতঃ বাংলাদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যত গতিপথ নির্ণয় তথা তাঁদের শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের কথা চিন্তা করে মাওলানা আকরম খাঁ সাংবাদিকতার পেশা অবলম্বন করেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি সাপ্তাহিক 'আহলে হাদীস' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।[২] ১৯০১ সালে তিনি ত্রৈমাসিক মোহাম্মদী সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৯০৩ সালে ইহা মাসিক এবং ১৯১০ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর নিজস্ব মালিকানা ও সম্পাদনায় পরপর প্রকাশিত হয় মাসিক আলএসলাম (১৯১৫), দৈনিক জামানা (১৯২০), সাপ্তাহিক ও দৈনিক সেবক (১৯২১), দৈনিক মোহাম্মদ (১৯২২), মাসিক মোহাম্মদ (১৯২৭), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬), সাপ্তাহিক কমরেড (১৯৪৬) প্রভৃতি।[৩]

মাওলানা আকরম খাঁ অনেক সংবাদ ও প্রবন্ধ বাংলা থেকে উর্দু এবং উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে পত্রিকায় ছেপেছেন।[৪] সাংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলা ভাষায় যুক্তিবাদী ইসলামী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাহিত্য রচনার মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর বৃহৎ একটি জীবনচরিত ছিলো। তাঁর প্রথম রচনা হলো কারাবরণের সওগাত- 'আমপারার বঙ্গানুবাদ'।[৫] আর মোস্তফা-চরিত হলো তাঁর দ্বিতীয়, ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ।[৬] এছাড়াও তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তাফছীরুল কোরআন (৫ খন্ড), সদস্যা ও সমাধান, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রীস্টান ধর্ম, মূল বাইবেল কোথায়? প্রভৃতি তাঁর পান্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে এবং তাঁকে একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর সাহিত্য সাধনা, ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস চর্চা নিছক সৌখিনতা বা বিলাসিতামাত্র ছিল না। বরং যুগ-ভাবনা থেকে পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমানের চৈতন্যোদয়ের লক্ষ্যেই তাঁর লেখনী পরিচালিত হতো।[৭]

মহানবী (সাঃ) এর জীবনী সাধারণত দু'ধরনের উৎস থেকে সংকলিত হয়ে থাকে। (ক) সাধারন ইতিহাস এবং (খ) মহানবী (সাঃ) এর জীবন সংক্রান্ত বিশেষ

গ্রন্থসমূহ। আরবিতে প্রথম ধরনের গ্রন্থসমূহ 'তারীখ' এবং দ্বিতীয় ধরণের গ্রন্থসমূহকে 'সীরাত' বলা হয় যথা ঃ 'তারীখে তাবারী' ও 'সীরাতে ইবনে হিশাম'।[৮] ইতিহাস গ্রন্থসমূহে সৃষ্টির শুরু থেকে লেখক তাঁর সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন রাজত্বের উত্থান-পতন এবং বিভিন্ন ধরনের বিবরণ দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে এতে মহানবী (সাঃ) এবং ইসলামের ইতিবৃত্ত ও বর্ণিত হয়।

'সীরাত' বা চরিতগ্রন্থে শুধু মহানবী (সাঃ)-এর জীবন বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সবিস্তারে বিবৃত হয়।[৯] মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যতো সীরাত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই গতানুগতিক। সেখানে যুক্তিবাদ তেমন একটা স্থান পায়নি। রাসূলে কারীম (সাঃ) কে বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতার মাপকাঠিতে বিচার করা হয়নি। পূর্বেকার অনেক লেখক অনেক দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে রাসূলের জীবনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মাওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রীঃ) এখানে স্বতন্ত্রপথ অবলম্বন করেন। তিনি হাদীসগুলোকে নিয়ে যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করে দেখেন যে, কোনটি সত্যিকার অর্থে রাসূলের হাদীস। এমনও দেখা গেছে একটি হাদীসে সীরাত প্রমাণিত হয়, অন্য হাদীসে তা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে মাওলানা আকরম খাঁ হাদীসের সত্যতা বিচারে অবতীর্ণ হন। তাঁর বৈপ্লবিক দৃস্টিভঙ্গিকে এক শ্রেণীর আলেম নিন্দা করেছিলেন। হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করায় অনেকে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন।[১০] কিন্তু এতে তিনি পিছপা হননি। যে হাদীসগুলো তাঁর কাছে খাঁটি বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি 'মোস্তফা-চরিত' রচনা করেন। এ সম্পর্কে মাওলনা আকরম খাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> "হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী রচনা-ব্যাপারে অন্যান্য লেখকগণ এ যাবৎ সাধারণত যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছি। ইহাদের অধিকাংশই হযরতের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ তাবরী, তাবকাত, এবন-হেশাম ও ওয়াকেদীর উপর নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোরআন-হাদীসের মাপকাঠিতে ঐসব বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সার্বভৌম মানব-ধর্মের যিনি প্রবর্তক, সেই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় কেবল ইতিহাসকারদের উপর নির্ভর করা আমি নিরাপদ মনে করি নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথাকে আমি কোরআন হাদীসের তুলাদন্ডে পরিমাপ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকটি বর্ণনার সত্যাসত্যের জন্য আমি কোরআন হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।"[১১]

'মোস্তফা চরিত' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যুক্তিভিত্তিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত।[১২] এই গ্রন্থের উপক্রমণিকাভাগে সহীহ হাদীসের পরিচয় দিতে গিয়ে মাওলানা সাহেব গভীর অধ্যয়নের পরিচয় দিয়েছেন।[১৩]

গ্রন্থটি আগাগোড়া তিনি তাঁর ভাষার আভিজাত্য রক্ষা করেছেন। গুরুগম্ভীর এবং সংস্কৃতবহুল শব্দের প্রতি তাঁর যে একটি বিশেষ ঝোঁক আছে, এ গ্রন্থে তার পুরোপুরি নিদর্শন রয়েছে।[১৪] সীরাত ও তফসীর গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি যে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি-বিচারের পরিচয় দিয়েছেন তা দুর্লভ।[১৫] মাওলানা আকরম খাঁ যখন জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে ইসলামী সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে শুরু করেন, তখন মুসলিম সমাজে যুক্তির কদর ছিল না। বরং যুক্তিকে অবজ্ঞা ও সন্দেহের চোখে দেখা হতো।[১৬] ফলে কোনো কোনো মুসলমান পন্ডিত তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।[১৭] এ প্রসঙ্গে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"আমার মনে আছে যে, বাল্যকালে আমাদের বাড়ির মওলবী সাহেব আমাদের 'মোস্তফা চরিত' পড়তে নিষেধ করতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন যে, 'মোস্তফা চরিত' পড়লে ঈমান জঈফ হয়। কারণ তিনি প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সমর্থন করেননি। বয়স হলে যখন 'মোস্তফা চরিত' পড়ার সুযোগ ঘটলো, তখন বুঝতে পারলাম মওলবী সাহেবের আপত্তির কারণ। গ্রামের মওলুদ শরীফের মাহফিলে নবী করীম (সাঃ)-এর যে চিত্র তুলে ধরা হয়, তার সঙ্গে 'মোস্তফা চরিত' এর নবীর মিল খুব কম"।[১৮]

বাঙালি মুসলমানের লেখা মহানবী (সাঃ)-এর প্রথম জীবনীগ্রন্থ শেখ আবদুর রহীমের 'হযরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭)-তে যুক্তিবাদের সূচনা দেখা দিয়েছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এর প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটে মোস্ত ফা চরিতে।[১৯] উর্দু ভাষায় মহানবী (সাঃ)-এর সীরাতের প্রথম সূত্রপাত করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।[২০] বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণসহ স্যার সৈয়দ আহমদের রচিত উর্দু গ্রন্থ খুতবাতে আহমদিয়া ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়।[২১] এ বছরই এর ইংরেজি সংস্করণ '*Essays on the life of Mohammad (Sm)*' নামে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়।

খুতবাতে আহমদিয়ার অনুকরণে এবং এর চাইতে অনেকটা উন্নত আকারে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় সায়্যিদ আমীর আলীর '*The Spirit of Islam*' মাওলানা আকরম খাঁ খুতবাতে আহমদিয়া এবং '*The Spirit of Islam*' গ্রন্থদ্বয়ের প্রশংসা করেন।[২২] কোনো কোনো বিষয়ে তিনি স্যার সৈয়দের অভিমত সমর্থন না করলেও তাঁর মানসপটে স্যার সৈয়দ চিন্তা-ধারার যে প্রভূত প্রভাব রয়েছে, তা *'মোস্তফা চরিত'* ও *'খুতবাতে আহমদিয়া'কে* পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে খুব সহজেই অনুমিত হয়।[২৩] তিনি কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান রচিত সীরাত গ্রন্থ *'রহমাতুল্লিল আলামীন'*-এরও প্রশংসা করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদের *'খুতবাতে আহমদিয়ার* প্রতিবাদস্বরূপ 'আল্লামা শিবলী নোমানী *সীরাতুন্নবী* নামক একটি বৃহৎ সীরাতগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ

করেন। তিনি এর দুখন্ড রচনা করে ইন্তিকাল করেন। আর শিবলী নোমানীর পরিকল্পিত বাকী খণ্ডগুলো রচনা করেন তাঁর উত্তরসুরী মাওলানা সুলায়মান নদভী। এই পুস্তকখানিকে মাওলানা আকরম খাঁ 'মহানবী (সাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কীয় বিরাট বিশ্বকোষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। খুতবাতে আহমদিয়া'তে বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে বর্ণিত জমহুর উলামা বিরোধী অভিমতসমূহ খণ্ডন করা হয় সায়্যিদ সুলায়মান নদ্ভী রচিত 'সীরাতুন্নবী' এর তৃতীয় খন্ডে। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর রচিত 'মোস্তফা চরিত'র কোথাও কোথাও শিবলী নোমানী প্রণীত 'সীরাতুন্নবী'-এর বহু অভিমতের বিরোধিতা করেন। মাওলানা সুলায়মান নদভী রচিত অন্য খন্ডগুলো তখনও সংকলিত হয়নি।

মাওলানা আকরম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিত (তৃতীয় সংস্করণ) কলিকাতা থেকে ১৮ই জুলাই, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৪২ সালে এর প্রতিবাদে প্রকাশিত হয় কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর মোস্তফা চরিতে যে সকল অলৌকিক ঘটনা অস্বীকার করেছেন, কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর বিশ্বনবীতে যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনায় কবিসুলভ শিল্পরস এবং চমকপ্রদ রচনাশৈলী রয়েছে। এ জন্য 'বিশ্বনবী' অধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[২৫] 'বিশ্বনবী'কে 'সীরাতুন্নবী'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়। 'সীরাতুন্নবী'র তৃতীয় খন্ডে সৈয়দ সুলায়মান নদভী রাসূলে কারীমের অলৌকিক ঘটনাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর বিশ্বনবীতে সে সবেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর কবি সুলভ শিল্পরস এবং চমকপ্রদ রচনাশৈলীকে বাদদিলে এ গ্রন্থে তেমন কোন অভিনবত্বের পরিচয় মেলে না। সৈয়দ সুলায়মান নদভী তাঁর 'সীরাতুন নবী' গ্রন্থে চিরাচরিত পদ্ধতিতে বর্ণিত রাসূলে কারীমের অলৌকিক ঘটনাবলীকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে খাপখাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। কবি গোলাম মোস্তফা সৈয়দ সুলামান নদভীর পথ ধরে পুরনো ভাবধারায় আপন কবিত্বরস সিঞ্চন করে তাকে রসাল ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। অন্য দিকে 'মোস্তফা চরিত' রচনায় মাওলানা সাহেব ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্যসমূহের উপরই নির্ভর করেননি, বরং কুরআন ও হাদীসের মানদন্ডে এ সবের যাচাই-বাছাই করেছেন। এ জীবন চরিতটি অন্যান্য সীরাতগ্রন্থ অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। এতে বহু নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৬]

মোস্তফা চরিত গ্রন্থে লেখক নবী সম্পর্কে প্রচলিত বহুতথ্য ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছেন। সাথে সাথে জমহুর উলামা কর্তৃক বর্ণিত বহু বর্ণনা ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করেছেন।[২৭] শৈশবে মহানবী (সাঃ)-এর বক্ষবিদারণ, মহানবী (সাঃ) এর দৈহিক মিরাজ, রাসূলের মোজেযা, জীনের ধারণা, ফেরেস্তার ধারণা, রাসূলের

জন্ম ও একাধিক বিবাহ, ইসলামে পর্দা ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা সাহেব স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করেন।

'মোস্তফা চরিতে'র বহু মতামত আলেম সমাজে গৃহীত হয়নি। মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন রচিত ১১৫ পৃষ্ঠার *'খা সাহেবের মোস্তপা চরিতের প্রতিবাদ'* এবং কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' ইত্যাদি গ্রন্থে এসব মতের তীব্র সমালোচনা রয়েছে।[২৮]

দুই

'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত; একটি উপক্রমণিকা ভাগ, অন্যটি ইতিহাস ভাগ। উপক্রমণিকাতে মোস্তফা-চরিতের উপকরণ, মোস্তফা চরিতের তিনটি সূত্র, হাদীস সম্বন্ধে আলোচনা, পরীক্ষার নতুন ধারা, রেওয়ায়ৎ ও দেরায়ৎ, হাদীসের শ্রেণী বিভাগ, মরফুহুকমী, জাল ও অপ্রামাণিক বা মওযু হাদীস, হাদীস মওযু হওয়ার কারন, পূর্ববর্তী জীবনী রচয়িতা, মুসলমান গ্রন্থকার কর্তৃক অন্যান্য ভাষায় লিখিত জীবনী, হযরতের জীবনী ও পাশ্চাত্য লেখকগণ এবং খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সহিত তুলনা- প্রভৃতি বিষয় মোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে।[২৯] ইতিহাসভাগে প্রাক এসলামিক যুগের আরব, পাদরীদিগের প্রমাদ, এসমাইল ও এসহাক, এসমাইলের কোরবানী সম্বন্ধে কোরআনের উক্তি, আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, এসলামের পূর্বে জগতের অবস্থা, শেষ নবী আরবে আসিলেন কেন, হযরত আবির্ভাব, হযরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ব্যাপার, ধাত্রীগৃহে, বক্ষ বিদারণ ব্যাপার, মৃগী বা মুর্ছারোগ ভিত্তিহীন কল্পনা, বিপদের উপর বিপদ, অন্যান্য ঘটনা, সিরিয়া যাত্রা, যৌবনের প্রথম সাধনা, তাহেরা ও আল-আমীন, কাবার পুণনির্মাণ, সাংসারিক জীবনের কয়েকটা ঘটনা, সময় নিকটবর্তী হইতেছে, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, কঠোর পরীক্ষা, দেশত্যাগের সংকল্প, কোরেশের নতুন ষড়যন্ত্র, ঐতিহাসিক প্রমাদ, ভীষণ উক্তি, মুসলমান লেখকগণের অবহেলা, কোরেশদিগের ক্ষোভ ও কঠোরতর পরীক্ষা, খ্রীষ্টান লেখকগণের চাঞ্চল্য, তীর্থমেলায় এসলাম প্রচার, সফলতার প্রথম সূচনা, মদীনার মহামুক্তি, মদীনা প্রয়াণের শুভসূচনা, মদীনায় কৃতকার্যতা-কারণ কি, বায়আৎ-প্রকৃত তথ্য, দেশ ত্যাগের সংকল্প, আনছারগণের সৌজন্য, পূর্ণচন্দ্র গুহায় লুকাইলেন, মদীনার পথে, মদীনা প্রবেশ, খ্রীষ্টান লেখকগণের সাধুতা, মদীনার প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমূহ, প্রথম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা, মক্কার ১৩ বছর, কোরেশদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র, এসলামের প্রথম ধর্মসমর, বদর সমর-ভক্তগণের ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা, বদর সমর সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা, দ্বিতীয় হিজরীর অন্যান্য ঘটনা, ইহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, ওহোদের অগ্নি পরীক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য পরিবর্তন, চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী, সমস্ত আরবগোত্রের সমবেত শত্রুতা, কোরেজা গোত্রের প্রতি সামরিক

দন্ড, মুছলমানদিগের তীর্থযাত্রা হোদায়বিয়া সন্ধি, খায়বার বিজয়, ঐতিহাসিক প্রমাদ, ধর্মের আহ্বান, খালেদ, ওছমান ও আমরের এসলাম গ্রহণ, খ্রীস্টান শক্তির বিরোদ্ধাচরণ– মুতাঅভিযান ও তাহার কারণ, মক্কা বিজয়, হযরতের নগর প্রবেশ, অপরাধিগণের প্রাণদন্ড, বিভিন্ন ঘটনা, হোনেন, আওতাছ ও তায়েফসমর, নবম হিজরী– সত্যের জয়জয়কার, বিভিন্ন ঘটনা, প্রতিনিধি সঙ্ঘ সমূহের সমাগম, বিদায় হজ্জ্ব, একাদশ হিজরী বা শেষ বৎসর মোট– ঊনাশিটি পরিচ্ছেদে মহানবী (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গজীবনী আলোচিত হয়েছে।

মাওলানা আকরম খাঁ এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা প্রথম পরিচ্ছেদের 'প্রাথমিক কথা' শিরোনামে বলেছেন ঃ

"কোনো ধর্মের বিশেষত্ব ও সত্যতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই ধর্মের প্রবর্তক যিনি, সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই সম্যকরূপে চিনিয়া ও বুঝিয়া লইতে হয়। ...এছলামের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে– এছলামের সত্যতা ও বিশেষত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে সর্বপ্রথম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে অন্ততঃ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।[৩০]

তিনি আরো বলেন ঃ

"মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা এ সব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্ত রে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলেনা। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কুলরক্ষা করার জন্য কতকগুলি আজগুবী, অনৈতিহাসিক গল্প-গুজব এবং কতকগুলি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিষ্কার করেন এবং সেগুলির মধ্য দিয়া মহাপুরুষের নামের জয়জয়কার করিয়া মনে করেন যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে ঐসব কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী মহপুরুষের জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া ইতিহাস ও পুরান-পুস্তকসমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তাহাই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কেহ কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া, এমন কি মূল শাস্ত্র গ্রন্থের শতশত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও কিন্তু ভক্তের নিকট সবই বিফল। তিনি এককথায় এসকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন– প্রাচীন মুনি-ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ, ছলফে ছালেহীন ও 'বোজর্গানে দীন' কি এসকল কথা বুঝিতেন না? তোমরা বাপু কি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান হইয়াছ? বাপ-পিতামহ চৌদ্দপুরুষ যাহা বুঝিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন তাহাকেই আকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে। 'স্বধর্মে নির্ধনং শ্রেয়ঃ পরোর্ধমো ভয়াবহঃ'। ইহাই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।"[৩১]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন ঃ "পূর্বকথিত ভক্তরূপী শত্রুগণের কল্পনার বাহাদুরী ও তাঁহাদের সহজসাধ্য অতিভক্তির শোচনীয় ফলে কত আদর্শ মহাপুরুষ, কত অলি দরবেশের, এমন কি কত নবী-রাসূলের পবিত্র জীবনী যে আজও সত্যের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে এবং তাহাতে জগতে জ্ঞান, ধর্ম, কর্ম ও মনুষ্যত্বের যে কত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে।[৩২] বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রামাণিক দলিল প্রমাণের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদিগের কল্পনা, অজ্ঞতা ও অতিরঞ্জনের ফলে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন চরিত আজ কার্যতঃ অজ্ঞেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।... যীশু সম্বন্ধে এই সমস্যাটি আরও জটিল ও অসমাধ্য। কারণ বহুশতাব্দী পর্যন্ত কতকগুলি অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক আজগুবী ঘটনার মধ্যে যীশু-চরিত্রের মহত্ত্বগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।... হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সম্বন্ধেও অবস্থা কতকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার জীবনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে যেসকল বহি-পুস্তক পরবর্তী কালে লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সত্য-মিথ্যা, বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য, প্রকৃত ও প্রক্ষিপ্ত রেওয়ায়েৎসমূহে পরিপূর্ণ। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ আনন্দেরও সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাঁহার নবী জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানা যায়। পরবর্তী রেওয়ায়েৎ ও ইতিহাসের প্রতি দৃকপাত না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না।[৩৩]

বলাই বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য মোস্তফা-চরিতের মূল্যায়ন শতাব্দী বহমান ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তবে যা সত্য, তা এই কোরআন, হাদীস ও ইতিহাস মোস্তফা চরিতে ছড়িয়ে দিয়েছে নতুন স্বাদ, নতুন সৌরভ আর স্বাতন্ত্র্য কোরআনে যেসকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাসে বা চরিত পুস্তকে, এমন কি হাদীছের রেওয়ায়াতেও যদি তার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, তবে কোরআনের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য বলে নির্ধারণ করবো। মাওলানা আকরম খাঁ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ভিত্তিতেই মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) জীবনীকে প্রামাণিক দৃষ্টিতে 'মোস্তফা চরিতে'র মধ্যে আলোচনা করেছেন।

হাদীস প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, 'হযরতের জীবনী বহু বিবরণ হাদীছ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। বিশেষতঃ হযরতের চরিত্র-মাহাত্ম্য ও তাঁহার ২৩ বৎসর নবী-জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস, শাসন ও বিচার, বাণিজ্য ও কৃষি, আন্তর্জাতিক আইন কানুন, সমর নীতি, দেশসেবা ও লোকসেবা প্রভৃতি সংক্রান্ত শিক্ষা সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে আত্মা সম্বন্ধে, কর্মফল সম্বন্ধে, মানবীয় জ্ঞান ও বিবেকের দাসত্ব মোচন সম্বন্ধে এবং আত্মার বিকাশ ও মুক্তি সম্বন্ধে তিনি যে কি মহীয়শী শিক্ষা-কি অতুলনীয় স্বর্গীয়

আদর্শ ধরাধামে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।[৩৪] এ ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–অন্যান্য সীরাতকারগণ সীরাত রচনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাদীসকে যাচাই বাছাই না করেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি হাদীছ গ্রহণকালে হাদীসের রাবী, সনদ ও মতন তথা হাদীসের যাবতীয় বিষয়কে যাচাই করার পর তা গ্রহণ করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁ জাল, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও মউযু হাদীস যাচাই করার জন্য অশেষ অধ্যবসায় করেছেন। এক্ষেত্রে আকরম খাঁ বেশ কয়েকটি জাল হাদীসের উল্লেখ করেছেন।[৩৫] মাওলানা আকরম খাঁ মওযু হাদীসগুলো যাচাইয়ের নিয়ম-পদ্ধতি, মারফু হাদীস চেনার পদ্ধতি, মোটকথা হাদীস সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'মোস্তফা-চরিত' রচনার ক্ষেত্রে যা অন্য কোন সীরাত রচয়িতা জীবন-চরিত রচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি।[৩৬]

মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিতে'র উপক্রমণিকার সর্বশেষ যে অংশটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় তা হলো নবী জীবনী সম্পর্কে পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান এবং যুক্তিদ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতের খণ্ডন। তিনি পবিত্র কোরআনকে খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহের সঙ্গে ও মোস্তফা (সাঃ)-এর জীবন নিয়ে রচিত মোস্তফা চরিতকে বেদ, বাইবেল, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থের সাথে তুলনা করেছেন এ অংশে।

ইসলাম ও তার প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে নতুন ধরনের বই-পুস্তক লিখিত হতে আরম্ভ হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হতে। এ যুগের লেখকগণ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে সত্য উদ্ধার ও অসত্যের প্রতিবাদ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। নানা কারণে তাঁদের এই সাধুচেষ্টা সর্বত্র সফলতা লাভ করতে পারেনি। "কিন্তু এ কথা আজ কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই শ্রেণীর ইংরাজ লেখকগণের সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের ফলেই 'এছলাম ও মোহাম্মদ' সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের বহু শতাব্দীর বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের ঘোর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া যায় এবং আমাদের মতে ইউরোপে এছলাম প্রচারের প্রথম সূচনা হয় এই সময় হইতে। ইহারা ব্যতীত অন্যান্য লেখকগণ হযরতের জীবনী সম্বন্ধে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় যেরূপে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন 'মোস্তফা চরিত' সাধারণতঃ তাহারই সমষ্টিগত প্রতিবাদ।"[৩৭]

মোস্তফা চরিত গ্রন্থে মাওলানা আকরম খাঁ নবীজীর জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রারম্ভে আরববাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলো হল আরবদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জনপদ, বিভিন্ন বংশ-গোত্রের ব্যক্তিগত আবাস ভূমি, শিক্ষিত লোকের অভাব, তাদের কবিত্ব, অসাধারণ স্মৃতি শক্তি, সর্বদা রুক্ষ মনোভাব, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি, একজন বলিষ্ঠ নেতার অভাব, জাতিভেদ, কাবা শরীফকে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম-মন্দির বলে বিশ্বাস, আতিথেয়তা, পরশ্রীকাতরতা এবং

এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের রয়েছে সংবেদনশীলতা। মাওলানা সাহেব মোস্তফা-চরিতে কোরআনের পরিচয় শেষে তাওরাত তথা বর্তমান বাইবেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ঐতিহাসিক প্রমাদ, বর্তমানে বাইবেলের পরিণতি, বাইবেলের ঐতিহাসিক মূল্য, বাইবেলে খ্রীষ্টানদের নিজস্ব মতামত সংযোজন এবং ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক মূল্য ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তিনি সূক্ষ্ম যুক্তির মাধ্যমে বাইবেল রচয়িতাদের পক্ষ থেকেই এই রচনার অসারতা প্রমাণ করার মত অভিনব প্রচেষ্টা চালিয়ে সক্ষম হন। আর তা হলো– "দীর্ঘ ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টান সমাজ এই পুস্তকগুলিকে (২৮ খানি পুস্তক ও ৯২ খানা পত্র অপ্রামাণিক এবং মাত্র ৬ খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র প্রামাণিক) প্রত্যক্ষ ঐশীবাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইউরোপে স্বাধীন ও দার্শনিকভাবে ইতিহাস বিচারের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাইবেল সম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার অস্টাস যীশু জীবনী' নামক পুস্তক খানি প্রকাশ করেন। হেগেলের (Hegel) ইতিহাস-দর্শনানুসারে বাইবেলের (নতুন নিয়মের) বর্ণিত বিবরণগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, যীশুর জন্ম-বৃত্তান্ত ও তাঁহার নানা প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন ইত্যাদি ইঞ্জিলের সমস্ত বিবরণ কল্পিত উপ-কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"[৩৮] এভাবে মাওলানা সাহেব বাইবেল রচয়িতাদের মাধ্যমেই রচিত গ্রন্থ থেকে তাদের মতের অসারতা প্রমাণ করেন।

মোস্তফা চরিত এর মূল্যায়নে আরেকটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। তা হলো যোসেফ ও যীশুর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়। মথি লিখিত ইঞ্জিরে প্রথম অধ্যায়ে এবং লুকের ইঞ্জিলের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৮ পদে যীশুর 'বংশাবলী-পত্র' প্রদত্ত হয়েছে। তাতে জানা যায় যে, যীশু-জননী মরিয়ম যোসেফ নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী। এই যোসেফ দাউদের সন্তান এবং দাউদ এছহাকের পুত্র যাকোবের সন্তান। "অতএব এবরাহিমের নিকট সদাপ্রভু যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র এছহাক ও পৌত্র যাকোবের মধ্যবর্তিতায় বংশ পরম্পরাক্রমে দাউদে, দাউদ হইতে যোসেফে এবং যোসেফ হইতে যীশুতে বর্তিয়াছিল। অতএব ঐ আশীর্বাদ প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই জন্ম ও শোণিতগত অধিকার।"[৩৯] আকরম খাঁ এই তথ্যের প্রমাণকল্পে বলেন, "স্বীকার করিলাম– যোসেফ দাউদের সন্তান এবং ইহাও স্বীকার করিলাম যে, পিতৃশুক্রের সঙ্গে সঙ্গে সদাপ্রভুর আশীর্বাদ ও বংশ পরম্পরাক্রমে যোসেফে আসিয়া বর্তিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যীশু এই যোসেফের কে? যীশু জননী মরিয়ম গর্ভবতী হইলেন– 'হোলি-ঘোস্ট' বা পবিত্র আত্মা হইতে, আর তাঁহার পিতা হইলেন– সদাপ্রভু স্বয়ং। মরিয়মের সহিত যোসেফের 'সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা হইতে।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, যীশুর শরীরে যোসেফের শোণিত একবিন্দুও বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং যথাক্রমে

এবরাহিম, এছহাক, যাকোব ও যোসেফের বংশানুক্রমিক ও জন্মগত অধিকার-সদাপ্রভু-এর আশীর্বাদ-যীশুতে বর্তায় নাই। কারণ তিনি যোসেফের সন্তানই নহেন।"[৪০] মাওলানা আকরম খাঁ এখানে প্রমাণ করেন যে, মরিয়মের কোনো স্বামী ছিল না, আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় ঈছা (আঃ) মরিয়মের গর্ভে আসেন।

মোস্তফা চরিত গ্রন্থে মাওলানা সাহেব নবীজী ও ইসলাম সম্পর্কে কোন কোন ইউরোপীয় লেখক, বিশেষ করে উইলিয়াম মুইরের বহু অভিযোগ খন্ড করেন এবং বহু তথ্যের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন। যেমন– আধুনিক খ্রিস্টান লেখকদের একটি বক্তব্য হলো হযরত ইব্রাহীম বা ইসমাঈল (আঃ) আরব দেশে আগমন করেননি এবং কাবাঘরও নির্মাণ করেন নি।[৪১] কাবার সংস্কার সম্পর্কে অন্য ধর্মাবলম্বী লেখকগণ যৎপরোনাস্তি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মতে, "হযরত এবরাহীম ও তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল যে, প্রান্তরে বা অন্যকুত্রাপি উপাসনা ও বলিদানের স্থান মনোনীত হইলে তথায় তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ একখানা প্রস্তর স্থাপন করিতেন। বাইবেলেও ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। হযরত এবরাহীম ও এসমাঈল মক্কায় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথানিয়মে সেখানেও একখানা প্রস্তর রাখিয়াছিলেন। ... মক্কা বিজয়ের পর হযরত যখন বোৎ বিগ্রহগুলি কাবা হইতে অপসারিত করিয়া ফেলেন, তখন এই জন্যই ঐ প্রস্তরটিকে স্বস্থানচ্যুত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় নাই। অথচ এই প্রস্তর খানা জগতে একজন আদি ধর্মপ্রবর্তক ও সংস্কারক এবং কোরেশ বংশের আদি পিতা মহাপুরুষ হযরত এবরাহীমের পুণ্যস্মৃতি ও যুগ-যুগান্তরের মূর্তিমান ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কাজেই উহা পূর্ববৎ স্বস্থানে রহিয়া গেল। হযরত এবরাহীম প্রথমে হজ্জ প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া মুছলমানগণ এখন হজ্বব্রত যাপন কালে কো'বা প্রদক্ষিণ করার সময়) ঐ প্রস্তরের নিকট হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন আবার তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে একবারের প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) শেষ হইলো বলিয়া মনে করেন।"[৪২] পরিতাপের বিষয় যে, যে ঘর হযরত আদম (আঃ) এর পর পর্যায়ক্রমে আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে নির্বোধ বিধর্মীরা 'একটা প্রস্তর ছিল, সেটাকে মুসলমানদের আদি পিতা ইব্রাহীম উপাসনা করতো' বলে মন্তব্য করেছেন। এমতের বিপক্ষে যথার্থতা প্রমাণে বিশ্বনবীতে বলা হয়েছে "বহুযুগ পরে হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর হুকুমে বিবি হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে ঠিক একই স্থানে নির্বাসন দিয়া আসিলেন। শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে যে ঝর্ণাধারা উন্মুক্ত হইল, উহাই সেই জমজম। কালক্রমে এই উৎসের চতুষ্পার্শ্বে নতুন করিয়া আরব জাতির বসতি স্থাপিত হইল।

হযরত ইব্রাহীম আসিয়া বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলের সহিত যখন এই খানে বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন আল্লাহ তাঁহার সেই লুপ্ত ঘরের বা বায়তুল্লাহর পুণর্নির্মাণের জন্য ইব্রাহীম-ইসমাইলকে আদেশ দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ পিতা-

পুত্র প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কোথায় যে সেই পবিত্র গৃহ অবস্থিত ছিল, তাহা সঠিকরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তখন আল্লাহর নির্দেশে একখণ্ড মেঘ আসিয়া প্রাচীন মসজিদের স্থান নির্ণয় করিয়া দিল। পিতাপুত্র মাটি খুঁড়িয়া সেই মসজিদের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করিলেন এবং সেই ভিত্তিমূলের উপরেই নতুন করিয়া কাবা গৃহ নির্মাণ করিলেন।"[৪৩] বর্তমান কাবা প্রাঙ্গণে যে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর লক্ষিত হয় এবং হাজীগণ যাতে ভক্তিভরে চুম্বন করে থাকেন, অনেকের মতে সেই প্রস্তর খানি হযরত আদমের সময়কার কাবা গৃহেরই প্রস্তরখন্ড বিশেষ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কাবা গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহীমেরও বহুপূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। তফসীরে হাক্কানীতে লিখিত আছে, "বিবি হাজেরা যখন বিজন মরুভূমির মধ্যে নিজেকে নিঃসহায় মনে করিয়া ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন জনৈক ফেরেস্তা আসিয়া কানে কানে তাঁহাকে এই আশ্বাস দিলেন ঃ "হাজেরা, কাঁদিও না। এই খানেই আল্লাহর ঘর পুশিদা আছে। তোমার পুত্র ইসমাইল বড় হইয়া এই ঘরকে পুণর্নির্মাণ করিবে।' ইহাই শুনিয়া হাজেরা আশ্বস্ত হইলেন।"[৪৪]

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের (আঃ) উপর আল্লাহ যখন কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণের আদেশ দেন তখন আল্লাহ যা বলেছিলেন, তা হতেও জানা যায় যে, কাবা পূর্ব হতেই তথায় বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ বলছেন, "এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র কর।" কোন গৃহের অস্তিত্ব পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাকলে তা পবিত্র করার কথা আসতে পারে না। বিশেষ করে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈলের হস্তে যে ঘর নির্মিত হল, তা যে অপবিত্র ছিল, একথারও কোন মানে হয় না। কাজেই এখানে যে হযরত ইব্রাহীমের পূর্ববর্তী অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে তা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। হযরত ইব্রাহীম কর্তৃক কাবা গৃহের নির্মাণ প্রসঙ্গেও কোরআনে পাকে যে আয়াত আছে, তাও এই কথারই সমর্থন করে। "এবং যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল (কাবা গৃহের) ভিত উঁচু করিতে ছিলেন, তখন তিনি (ইব্রাহীম) প্রার্থনা করিলেন ঃ 'হে আমার প্রভু! আমাদের ইহা (এই সুকার্য) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৪৫]

অতএব এখন যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে একথা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, কাবা গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল, যা আকরম খাঁ বলেছেন।

কতিপয় ইউরোপীয় লেখক মনে করেন যে, হযরত ইব্রাহীম হযরত ইসমাইলকে কোরবানী করার যে সংকল্প করেন, কোরআনে তার কোন প্রমাণ নেই। এর উত্তরে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন– "এবরাহিম (প্রার্থনা করিয়া) কহিল 'হে আমার প্রভু! আমাকে একটি সৎ সন্তান দান কর।' ইহাতে আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশালী বালকের সুসংবাদ দান করিলাম। অতঃপর সেই বালকটি যখন এবরাহিমের সহিত

চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল (অর্থাৎ যুবা বয়সে পদার্পণ করিল), তখন এবরাহিম তাহাকে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র। আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে (যেন) আমি তোমাকে 'জবেহ' করিতেছি। অতএব, তুমিও ভাবিয়া দেখ, এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?' সে কহিল– 'হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন (তাহা) করিয়া ফেলুন, আল্লাহর ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাইবেন।' অতঃপর যখন উভয় (পিতা-পুত্র) আত্মসমর্পণ করিল এবং পিতা পুত্রকে অধঃমুখে পতিত করিল, তখন আমরা তাহাকে আহ্বান করিলাম– 'হে এবরাহিম! তুমি স্বীয় স্বপ্নকে সত্য করিয়া দেখাইলে।' এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি। ... এবং আমরা তাহাকে এছহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম যে নবী হইতে সৎলোকদিগের মধ্য হইতে। এবং আমরা তাহাকে (কোরবানীর জন্য উপস্থাপিত প্রথম পুত্রকে) ও এছহাককে বরকৎ (আশীষ) দান করিলাম। কিন্তু তাহাদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ সৎকর্মশীল, আবার কেহ কেহ নিজের আত্মার প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারপরায়ণ। (ছাফফাৎ ৩য় রুকু)[৪৬]

হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জন্ম তারিখ নিয়ে যে মতভেদ সে সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ মনে করেন যে, হযরতের জন্ম তারিখ ৫৭১ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার সোবহে সাদেকের অব্যবহিত পর। অথচ হযরতের জন্ম তারিখ নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাবারী, এবনে খালদুন, এবনে হেশাম, প্রমুখ লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আবুল ফেদা বলেন– ঐ মাসের ১০ তারিখে হযরতের জন্ম হয়েছিল।[৪৭] তবে সমস্ত লেখকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, রবিউল আইয়াল মাসে সোমবার দিন হযরতের জন্ম হয়। আধুনিক মুছলমান লেখকগণ সূক্ষ্মভাবে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে, ১২ বা ১০ তারিখে সোমবার পড়তে পারে না। উহা ৯ ব্যতীত অন্য কোন তারিখ হতে পারে না।[৪৮] মাহমুদ পাশা ফারুকী এমত পোষণ করে বলেন ঃ

১. ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, হযরতের শিশুপুত্র এবরাহীমের মৃত্যুর দিন সুর্য গ্রহণ হইয়াছিল।

২. হিজরী ৮ম সালের জিলহজ মাসে এবরাহীমের জন্ম হয়। ১৮ বা ১৮৯ মাস বয়সে হিজরী দশম সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

৩. অংক কষিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত সূর্যগ্রহণ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বর তারিখে ৮ টা ৩০ মিনিটের সময় লাগিয়াছিল।

৪. এই তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, হযরতের জন্ম সনে ১২ এপ্রিল তারিখে রবিউল আইয়াল মাসের ১ তারিখ আরম্ভ হইয়াছিল।

৫. জন্মদিনের তারিখ নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, রবিউল আউয়াল মাসের ৮ হইতে ১২ পর্যন্ত এই মতভেদ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সোমবার সম্বন্ধেও কাহারো মতভেদ নাই।

৬. ৮ হইতে ১২ রবিউল আউয়ালের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার নাই।[৪৯]

হযরতের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণের পর মাওলানা আকরম খাঁর সিদ্ধান্ত এটিই হলো যে, তাঁর ভাষায়– "অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ রবিউল আউয়াল ২০ এপ্রিল (৫৭১ খ্রীঃ) সোমবার হযরত (সাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই সকল অকাট্য প্রমাণ বর্তমান থাকতেও যাঁরা হযরতের জন্ম তারিখ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট বলেছেন, তাঁদেরকে বিশেষ করে মুছলমান লেখকগণকে তিনি অন্ধ অনুকরণ ও ভ্রান্ত মত পোষণকারী বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৫০]

মাওলানা আকরম খাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বনবীতে বলা হয়েছে ঃ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন।[৫১] মোস্তফা চরিতে উদ্ধৃত মাওলানা সাহেবের প্রমাণগুলো পর্যালোচনা করে গোলাম মোস্তফা বলেন ঃ

"কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, উপরোক্ত প্রস্তাবনা (Premise) এবং যুক্তিধারা অনুসারে কী করিয়া যে 'নিশ্চিতরূপে' প্রমাণিত হয় যে, ৯ রবিউল আউয়াল তারিখেই হযরত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যুক্তি প্রমাণের যেসব উপকরণ জনাব পাশা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে কোন ক্রমেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে (Conclusion) পৌঁছা যায় না। স্বীকার করিলাম ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিনে যে সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছিল তাহা ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তারপর? মাত্র এইটুকু প্রস্তাবনা হইতে কি করিয়া হরতের জন্ম তারিখে পৌঁছানো যায়? এই তারিখটিকে ভিত্তি করিয়া যদি আমাদিগকে হযরত জন্ম তারিখ নির্ধারণ করিতেই হয়, তবে যুক্তির ধারা নিম্নরূপ হইবে ঃ

১. ইব্রাহীমের মৃত্যুর তারিখ (অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ৬৩২ খ্রিঃ) আরবি অমুক তারিখ ছিল।

২. ঐ তারিখে হযরতের বয়স এত বছর, এত মাস, এত দিন ছিল।

৩. অতএব, হিসাব করিলে দেখা যায় যে, হযরতের জন্ম অমুক আরবি সনের অমুক তারিখে হইয়াছিল।

কিন্তু পাশা সাহেব যুক্তিধারা সে পথে চলে নাই। একটি হইতে অন্যটি, অন্যটি হইতে আর একটি এইরূপে চলিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ঃ 'অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ রবিউল আউয়াল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

দ্বিতীয় কথা এই, মিসরীয় পাশা মহোদয়ের গণনা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া ফেলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ১২

রবিউল আউয়াল হইতে ৯ রবিউল আউয়াল তারিখে হযরতের জন্ম তারিখ স্থানান্তরিত হইলে মাত্র তিন দিনে অগ্রপশ্চাতৎ ঘটিয়া যায়। কিন্তু তাহা মোটেই নহে। এই ৯ রবিউল আউয়াল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ নহে। ইহা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ৯ রবিউল আউয়াল অর্থাৎ হযরতের কথিত জন্ম তারিখ প্রায় এক বৎসর পরবর্তী। সুতরাং ৮ হইতে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার নাই' এই যুক্তি খুবই বিভ্রান্তিকর'... 'গবেষণাকারীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। কেহ বলিতেছেন, ১০ রবিউল আউয়াল। কেহ বলিতেছেন ৮ রবিউল আউয়াল, কেহ বলিতেছেন ২০ এপ্রিল। ইহার উপরে বৎসরের গোলমালতো আছেই। কেহ বলিতেছেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, কেহ বলিতেছেন ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে, কেহবা ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে।" ... "আমাদের বক্তব্য এই যে, এই কথা যখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে না যে, ৯ রবিউল আউয়াল তারিখেই হযরত জন্ম হইয়াছিল, তখন প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত এবং মুসলিম জাহানের সর্বত্র স্বীকৃত ও প্রতিপালিত ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার তারিখকেই আমরা হযরতের জন্মদিন বলিয়া মানিয়া লইব।"[৫২]

কোনো কোনো স্বনামখ্যাত খ্রীস্টান লেখক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামকরণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। আর মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তির মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। হযরত ভূমিষ্ট হলে বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মোতালিব ৭ম দিবসে আকিকা করলেন এবং নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ'। এতে আকিকাতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ বলে উঠলো, 'এত নাম থাকতে মুহাম্মদ নাম রাখলে কেন?" আব্দুল মোত্তালিব তাদের কথার জবাব দেন এভাবে– "আমার এই সন্তানটি যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হউক, তা আমি চাই। তাই আমি তাহার এই নাম রাখিয়াছি। বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই অনুসারে তিনি পুত্রের নাম রাখলেন 'আহমদ'।[৫৩]

'মোহাম্মদ' ও 'আহমদ' এই উভয় নামই হযরতের বাল্যকাল হতেই প্রচলিত ছিল। কোরআনে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ (১) 'মোহাম্মদ (সাঃ) একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নহেন।' (২) 'মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নহেন, তিনি আল্লাহর রাসূল। (৩) "মরিয়মের পুত্র ঈসা বললেন, 'হে বনী ইসরাইলগণ!... আমার পর 'আহমদ' নামে যে রাসূল আসবেন, আমি তাঁর সুসংবাদ প্রদান করছি।"

আকরম খাঁর ভাষায় 'হযরতের এই উভয় নামেরই যে তাঁহার শৈশবকাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহা অস্বীকার করার ন্যায় হঠকারিতা আর কি হইতে পারে? কোন কোন স্বনামখ্যাত খ্রিস্টান লেখক এই প্রসঙ্গ যেরূপ চিত্তচাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া হাস্য-সংবরণ করা কষ্টকর।"[৫৪] প্রসঙ্গত বিশ্বনবীতেও উদ্ধৃত হয়েছে যে, "মুহাম্মদ অর্থ 'চরম প্রশংসিত'। কাজেই আল্লাহ যখন মুহাম্মদকে 'চরম প্রশংসিত' আখ্যা দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে মুহাম্মদ ছিলেন আল্লাহর

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদকে 'আহমদ' অর্থাৎ 'চরম প্রশংসাকারী' আখ্যা দিয়াছেন। ... আল্লাহকে তিনি যেরূপ চিনিয়াছিলেন এবং চিনাইয়াছিলেন, তাহা মানুষের পক্ষে একেবারে চরম বা চূড়ান্ত হইয়াছে। অন্য কথায় উহাই আমাদের নিকট আল্লাহর একমাত্র সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয়।"[৫৫]

'মোস্তফা চরিতে'র সাথে বিশ্বনবীর পার্থক্য হলো এই যে, মোস্তফা চরিতে 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' শব্দদ্বয় উল্লেখ করে কোরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ 'বিশ্বনবী'তে এতসব প্রমাণ পেশকরা হয়নি। 'মোস্তফা চরিতে' ভ্রান্ত মত পোষণকারীদের মতকে মাওলানা সাহেব যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করেছেন।

মাওলানা আকরম খাঁ নবীজীর মোজেজা অস্বীকার করেননি, তবে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্‌টা মোজেজা আর কোন্‌টা মোজেজা নয়, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন।[৫৬] এ সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন ঃ "মোজেজা নিশ্চয়ই সত্য এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাও নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু বিশ্বস্তরূপে তাহা প্রমাণিত হওয়া চাই। এজন্য আমাদের পূর্বতন আলেম ও ইমামগণ রেওয়ায়ৎ ও দেরায়াৎ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সত্যকে মিথ্যার আবর্জনা রাশির মধ্যে হইতে বাছিয়া লইবার যেপথ তাঁহারা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই যুক্তিসঙ্গত নিয়মাবলী অনুসারে সত্য-মিথ্যা এবং বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত ও কল্পিত উপকথাগুলি বাছাই করিয়া লইবার অধিকার আমাদের আছে। বরং কোরআনের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান এইরূপ করিতে বাধ্য।"[৫৭] রাসূলের দৈহিক মে'রাজকে তিনি সমর্থন করেননি। অথচ এর সম্ভাবনাকেও তিনি উড়িয়ে দেননি। দৈহিক মে'রাজকে তিনি কেন সমর্থন করেননি, তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণই আমাদিগের এই অসমর্থনের প্রধান কারণ। নচেৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসবে আমরা শেষোক্ত (দৈহিক মে'রাজ) মতের মূল বিবরণগুলিকেও অসম্ভব বলিয়া মনে করিনা।"[৫৮]

এ সম্পর্কে গোলাম মোস্তফার মন্তব্য–

> "ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে মোজেজাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মোজেজাকে অস্বীকার করিলে ইসলামের অনেক মূল বস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। জ্ঞানের অনেক পরিধিও বাহিরে পড়িয়া থাকে। মোজেজায় বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ।"[৫৯]

মাওলানা আকরম খাঁ রাসূল (সাঃ)-এর মেরাজকে অস্বীকার করেননি, তিনি অস্বীকার করেন তাঁর দৈহিক মে'রাজকে। অবশ্য এব্যাপারে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, রাসূল কারীমের মেরাজ দৈহিক নয়, স্বপ্নগত। তাঁর ধারনায় 'অসতর্ক রাবীদের কল্যানে মেরাজ সংক্রান্ত হযরতের বর্ণিত স্বপ্নের বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করেছে মাত্র।[৬০] তাঁর এ

বক্তব্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এ বক্তব্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী গ্রন্থে এ মতের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর ভাষায় ঃ

"যারা হযরতের সশরীরে আকাশ ভ্রমণের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছেন, তাদের অন্যতম দলিল ও যুক্তি হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

প্রত্যেকে জানেন ঃ পৃথিবীর আকর্ষনী শক্তি আছে যে কোনো শূন্যে অবস্থিত স্থূলবস্তুকে সে মাটির দিকে টানিয়া নামায়। কাজেই যুক্তিবাদীরা বলেন, হযরতের শরীরত আকাশভ্রমণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব। যে মাধ্যাকর্ষণ নীতির (Law of Gravitation) দোহাই দিয়া তাঁহারা মিরাজকে অস্বীকার করিতেন, সেই নীতিকে আজ বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। মহাকর্ষের ব্যাখ্যা তাঁহারা অন্যভাবে দিতেছেন। শূন্যে অবস্থিত কোন স্থূলবস্তুকে পৃথিবী যে সব সময়ে সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না, আজ তাহা পরীক্ষিত সত্য। পৃথিবীর যেমন আকর্ষণী শক্তি আছে, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরও তেমনি আকর্ষণী শক্তি আছে। সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর পরস্পরকে টানিয়া রাখিয়াছেন। এই টানাটানির ফলে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে কোন আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই। কাজেই পৃথিবীর কোন বস্তু যদি এই নিস্কৃয় সীমানায় (Neutral zone) পৌঁছতে পারে, অথবা এই সীমানা পার হইয়া সূর্যের সীমানায় পা দিতে পারে, তবে তাহার আর পৃথিবীতে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই।" ... "ইহাও সত্য যে, পৃথিবী কোন বস্তুকে অনুরূপ বা তদুর্ধ গতিবেগে যদি তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেও তাহার বেলায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বুক হইতে কোন স্থূল বস্তু যতই ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়, ততই তাহার ওজন (Weight) কমিতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার অগ্রগতি ক্রমেই সহজ হইয়া আসে।"[৬১]

এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক Arther G. Clark তাঁর 'The exploration of space' নামক পুস্তকে বলেন ঃ

> "As the distance from the earth lengthens into the thousands of miles, the reduction (of gravity) becomes substantial; twelve thousand miles up an one pound weight would weight only an ounce. It follows, therefore, that further away one goes from the Earth the easier it is to go onwards."[৬২]

গোলাম মোস্তফা বলেন,

> *"হযরতের সশরীরে আকাশ-ভ্রমণকে যাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌঁছানো অসম্ভব। কিন্তু আমাদের কথা এই হযরত মানব ছিলেন বলিইয়াই যে তাঁহার দেহ আমাদের ন্যায় জড় উপাদান বিশিষ্ট ছিল, তাহাত নাও হইতে পারে। বুনিয়াদ বা জাত এক হইলেও প্রত্যেক বস্তুর প্রকারভেদ তো আছে। কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত হয় এবং*

উভয়ই পদার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া কয়লা ও হীরক কি এক বস্তু? তাহা ছাড়া সমস্ত পদার্থের ধর্ম যে সর্বত্র একইরূপ থাকে তাহাও নহে। কাঁচ একটি জড় পদার্থ, বাধা দেওয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমাদের আঙ্গুল উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অমনি সে বাধা দেয়া; কিন্তু কোন আলোকরশ্মি দেখিলেই সে সসম্মানে তাহার জন্য নিজের দেহের ভিতর দিয়াই পথ ছাড়িয়া দেয়।"[৬৩]

অতএব, আমদের কথা এই, বাইরে হযরতকে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হয়ত তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না। জ্যোতিঃ বা নূর দ্বারাই তাঁর দেহ গঠিত ছিলো। এই জন্য প্রবাদ আছে ঃ 'রাসূলুল্লাহর দেহের কোন ছায়া ছিল না।' এর স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত "নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহর নুর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।"[৬৪] হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করিয়াছেন।'[৬৫] মাওলানা সাহেবের মতে, যেহেতু নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, সেহেতু মেরাজ সশরীরে হয়নি, তাঁর স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে। এর জবাবে বলা যায় হযরত তো মিরাজ শেষে এসে বলেননি যে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর যদি তা বলতেন, তা হলে ব্যাপারটিতো সেখানেই মিটে যেতো। কারণ স্বপ্ন নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করতেন না। তা ছাড়া এরূপ স্বপ্নের কথা কোরআন এবং হাদীসেও নেই।

মাওলানা আকরম খাঁ মোস্তফা চরিতে নবী চরিত সম্পর্কে প্রচলিত অনেক তথ্যই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছেন। এদের মধ্যে হযরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ব্যাপার একটি। নবীজীর জন্মোপলক্ষ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এখনো রয়েছে। সাধারণভাবে লিখিত নবী-জীবনী গ্রন্থসমূহে যেসব কথা স্থান লাভ করেছে, মাওলানা সাহেব সেসবের অসারতা প্রমাণ করেন। হযরতের পবিত্র চরিত্রে বা ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আজ পর্যন্ত যতো দিক দিয়ে ও যতো প্রকারে দোষ ত্রুটি আরোপ করা হয়েছে, আমাদের এই শ্রেণীর অতিভক্ত লেখকগণের কথা এবং অসতর্ক ঐতিহাসিকবর্গের বহু ঘটনা সংকলনস্পৃহা ও গড্ডালিকা প্রবাহই তার জন্যে বহুলাংশে দায়ী। এখানে এ সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ করা হলো ঃ কথিত আছে যে, হযরত যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করছিলেন, সে সময় তাঁর গর্ভধারিনী বিবি আমেনা এবং তাঁর পিতামহ আবদুল মোতালিব ও অন্যান্য স্বজনগণ নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা দর্শন করেছিলেন। হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সুতিকাগৃহ হতে এক আশ্চর্য নূর বা জ্যোত বের হয়েছিলো। পারস্যের বাদশাহ নওশেরওয়ার সৌধ চুড়াগুলো ভেঙ্গে পড়েছিল, অগ্নিপুজকদের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অগ্নিকুন্ডগুলি অবলীলাক্রমে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। জগতের সমস্ত পশু সেদিন মানুষের মতো কথা বলেছিলো। দুনিয়ার যাবতীয় রাজসিংহাসন উলটিয়ে পড়েছিলো। সেদিন কাবা মসজিদের ৩৬০টি বোৎ এবং পৃথিবীল সমস্ত ঠাকুর বা প্রতিমা অধঃমুখে ভুলুণ্ঠিত

হয়ে পড়েছিলো, নতুন নতুন গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয় হয়েছিলো, স্বর্গ হতে দেবদূতগণ এসে সুতিকাগৃহে জটলা পাকাচ্ছিল। এ ছাড়া তুষার ধবল পালক বিশিষ্ট স্বর্গীয় শ্বেত পক্ষীর আবির্ভাব হয়েছিল ইত্যাদি।[৬৬] মাওলানা আকরম খাঁর মতে, এগ্রুপগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীণ এবং কল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ধর্মের কথাতো দূরে থাকুক, ইতিহাসের হিসেবেও এ কিংবদন্তিগুলোর এক কানাকড়ির মূল্য নেই।

ঐ বর্ণনাগুলোর মূল্য উৎসের অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐসকল ঘটনা সন্দর্শন করেছেন এবং একথা সকলে স্বীকারও করেছেন। সে সম্পর্কে নবীজী বলেছেন ঃ "তারপর আমার মাতা স্বপ্ন দেখলেন।"[৬৭] হাদীসে বিবি আমেনার এই স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ আছে। আমাদের সাধারণ ইতিহাস লেখকগণ এই স্বপ্নকে অবিশ্বাস্য করেছেন তাদের গ্রন্থসমূহে। সাধারণ ইতিহাস লেখকগণ প্রামাণ্য ও প্রক্ষিপ্ত সকল প্রকার বিবরণ ও কিংবদন্তি গুলোকে তাঁদের পুস্তকে সংকলন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। খ্রিস্টান লেখকগণ তা হতে দু-চারটা অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে হযরতের চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্মবাচক বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকেও প্রমাণহীণ বলে উড়িয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। স্যার উইলিয়াম মুইর, ডাক্তার স্প্রেঙ্গার, মারগোলিয়থ প্রভৃতি খ্রিস্টান লেখকগণের পুস্তকের যে কোন অংশ পাঠ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। মোস্তফা চরিতে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন–

> *"ঐতিহাসিক তুলাদন্ডে সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া লইবার পূর্বে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রদত্ত বিবরণ, বিশেষতঃ অস্বাভাবিক ও আজগুবী কিংবদন্তিগুলিকে স্বীকার করা যাইতে পারে না।... ইতিহাসের সহিত যাহার একটুও সম্পর্ক আছে, তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, হযরত ওমরের খেলাফত যুগে পারস্য বিজয়ের পূর্বে পারস্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি একদিনের তরেও নির্বাপিত হয় নাই। হযরতের সময় মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাবা মসজিদের একটি বোৎও স্থানচ্যুত বা ভূপাতিত হয় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঠাকুর প্রতিমা বা বোৎগুলির এবং সিংহাসন সমূহের ভূপাতিত হওয়ার বা চতুষ্পদ জন্তু দিগের কথা বলার ঘটনা কোন দেশের কোন ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই।"[৬৮]*

মাওলানা আকরম খাঁ এই শ্রেণীর কিংবদন্তিগুলোর প্রতিবাদ করে আরো বলেন ঃ

> *"হযরতের জন্মের অসাধারণত্ব প্রতিপালন করার জন্য আমাদের এই শ্রেণীর কথকগণ বলিতেছেন, যে তাঁহার জন্মকালে নুতন গ্রহ নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া পরজাতীয় ও বিদেশীয় গণকবর্গ হযরতের জন্মের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই সকল কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁহারা অবাধে ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতিষী ও গণক ঠাকুরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।"[৬৯]*

কিন্তু আমরা ছহীহ মোছলেম, আবু দাউদ, মোছনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে দেখতে পাই, হযরত বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যার

এবং তার কথায় বিশ্বাস করে, কোরআনের ধর্মের সাথে তার কোন সংশ্রবই থাকে না।'[৭০] এই শ্রেণীর উপকথাগুলো কেবল অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিকই নয় বরং যুগপৎভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে তা ভয়ংকর কুসংস্কারমুলক পাপ। মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তি-তথ্য আর প্রমাণের মাধ্যমে এসব মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

বিবি হালিমার কাছে অবস্থানকালে ফেরেস্তাগণ হযরতের বক্ষ বিদারণ করেন বলে যে কথাটি জমহুর আলেমগণ বর্ণনা করেন, মাওলানা আকরম খাঁর মতে তা ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত যুক্তি-নির্ভর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। সহীহ মোসলেম এর বিবরণ অনুসারে–

> *"হযরত আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন– একদা হযরত বালকগণের সহিত খেলা করিতে ছিলেন এমন সময় জিব্রাইল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরতকে ধরিয়া চিৎভাবে শায়িত করিলেন তাঁহার বুক চিরিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তথা হইতে তাঁহার হৃদয় বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে কতকটা জমারক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'শয়তানের অংশ যাহা তোমার মধ্যে ছিল, তাহা এই।' অতঃপর জিব্রাইল হযরতের হৃদয় একখানা সোনার তশতরিতে রাখিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিলেন, পরে হৃদপিন্ডের কাটা অংশ জোড়া লাগাইয়া দিলেন এবং উহাকে যথাস্থানে সংস্থান করিলেন। এই সময় বালকগণ দৌড়িয়া হযরতের মাতার অর্থাৎ ধাত্রীর নিকট গিয়া বলিল, 'দেখ মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন।' অতঃপর সকলে তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল। তখন হযরতের চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি হযরতকে বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।"[৭১]*

এই হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যাচ্ছে যে, বক্ষ বিদারণ ধাত্রী হালিমার তত্বাবধানে অবস্থানকালে সংঘটিত হয়েছিল। অথচ বোখারী ও মোসলেমে এই আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত আরও একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরতের বক্ষ বিদারণের ঘটনা মেরাজের রাতে মক্কা নগরে সংঘটিত হয়েছিল। এসকল বিবরণের প্রধান রাবী আনাছের বর্ণনা হতে ইহাও সপ্রমাণ হচ্ছে যে, এটি হযরতের নিদ্রা অবস্থার স্বপ্ন মাত্র। তাহলে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় হযরতের বক্ষ বিদারণের ব্যাপারটি অবাস্তব মনে হবে। সহীহ মোসলেমের একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, আনাস (রাঃ) এর ঘটনার বিবরণ হযরত আবুজর (রাঃ)-এর নিকট হতে অবগত হয়েছেন। আবুজর (রাঃ) স্বয়ং হযরতের মুখে এ ঘটনার কথা জ্ঞাত হয়েছেন। কিন্তু এ হাদীস হতে এও জানা যাচ্ছে যে, আলোচ্য বক্ষ বিদারণের ঘটনা মেরাজের রাতে-সুতরাং হযরতের নবী হওয়ারও কিছু কাল পরে মক্কা নগরে তাঁর নিজ গৃহেই সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং শৈশবে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থান কালে বক্ষ বিদারণ হওয়ার কোন প্রমাণই এই হাদীস হতে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এর দ্বারা এই বিবরণের ভিত্তিহীনতাই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

বক্ষ বিদারণের ঘটনার সত্যতা নিরূপণে ও এর অসারতা প্রমাণকল্পে মাওলানা আকরাম খাঁ যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন, এগুলো খতিয়ে দেখলে মাওলানা সাহেবের মোস্তফা-চরিত-এ নিজের মতের যথার্থতা পাওয়া যাবে। এ ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকগন বলেছেন যে, হযরতের বক্ষ বিদারণ কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল ঃ

১. একবার হালিমার নিকট অবস্থান কালে,

২. একবার তাঁর দশ বছর বয়ক্রম কালে,

৩. একবার হেরা পর্বত-গুহায় জিব্রাইলের সহি দেখা-সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের সময় এবং

৪. একবার মেরাজের রাতে।[৭২]

প্রথমে বিচার করে দেখা দরকার যে, এই বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য কি ছিল। এ ব্যাপারে সকল হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন যে,

১. হযরতের শরীরে বা তাঁর অন্তঃকরণে শয়তানের অংশ ছিলো।

২. খোদা কর্তৃক নিয়োজিত জিব্রাইল ফেরেস্তা বা অন্যান্য ফেরেস্তাগণ তাঁর হৃদপিন্ড চিরিয়ে তার মধ্য হতে জমাট রক্তরূপী ঐ শয়তানের অংশ বা কুপ্রবৃত্তি বের করে ফেলেছেন।

৩. শয়তানী বা কু-প্রবৃত্তির অংশ হৃদপিন্ডের গায়ে যাতে জড়িয়ে না থাকতে পারে এ জন্য বেহেশত হতে আনিত সোনার রেকাবীতে রেখে জমজমের পানি দ্বারা তা উত্তমরূপে ধুইয়ে দেয়া হয়েছিল।

৪. ফেরেশতাগণ বেহেস্ত হতে একখানা সোনার তশতরী পুরিয়ে জ্ঞান ও বিশ্বাস (হেকমত ও ঈমান) এনেছিলেন এবং হযরতের বুক চিরে তার মধ্যে এ হেকমত ও বিশ্বাস পুরে দিয়ে আবার তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৭৩]

মাওলানা সাহেবের মতে, যদি এই বিবরণ সত্য বলেই মানতে হয় তা হলে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে,

১. হযরত জন্মতঃ আদৌ মাছুম ছিলেন না।

২. শয়তানের অংশ তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবে বলবৎ ছিল।

৩. এই শয়তানের অংশ, শয়তানী বা কুপ্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তজ্জন্য পাঁচবার তাঁহার বক্ষ বিদারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য স্বয়ং খোদাতায়ালাকে নিজের ফেরেশতাগণের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

৪. হযরত নবুয়ত পাওয়ার পরেও তাঁহার এই শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মেরাজের রাত্রিতেও তাঁহার হৃদপিন্ডে অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল।

৫. নবুয়তের পরেও হযরতের হৃদয় ঈমান শূন্য অবস্থায় ছিল।[৭৪]

এসব ভ্রান্ত কথার মাধ্যমে রাসূল সম্পর্কে অহেতুক কথা বলায় মাওলানা উভয় হাদীসকে অস্বীকার করেন। কারণ উভয় হাদীসের কথা এক নয় অথচ বিষয় এক। মাওলানা সাহেব বক্ষ বিদারণের ঘটনাকে কেন অস্বীকার করেছেন, তার যুক্তি দিয়ে তিনি আরো বলেন ঃ আনাছ কি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী না তিনি কারো কাছ থেকে তা প্রকাশ করেছেন? যদি অন্য কোন রাবীর কাছ থেকে শুনেন তাহলে সেই রাবীর সত্যাসত্য সম্পর্কে জানা আবশ্যক। কিন্তু আনাছতো সেই রাবীর নাম উল্লেখ করেননি। 'আনাছ হযরতের মুখে শুনিয়া বলিয়া থাকিবেন'– এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। কারণ ১. আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তখন আনাছের জন্মই হয়নি। হযরত ৫৩ বছর বয়সে মদীনায় হিজরত করেন। এ সময় আনাছের বয়স মাত্র ১০ বছর ছিল। কাজেই বিবি হালিমার নিকট হযরতের অবস্থান তাঁরা জন্মের ৪০ বছর পূর্বে ঘটেছিল।

অতএব আনাছ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে পরিগণিত হতে পারে না।

২. রাবী ছাবেৎ বলেছেন– 'আনাছ বলিলেন, আমি হযরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিতাম।'[৭৫]

এখন প্রশ্ন হলো এই সেলাইয়ের চিহ্ন কি আনাছ একাই দেখেছেন, না অন্যান্য সাহাবীরাও যাঁরা তাঁর চতুপার্শ্বে সর্বদা থাকতেন? হযরতের আপাদমস্তকের বর্ণনা বিভিন্ন সহীহ হাদীছে পাওয়া যায়। কিন্তু এই চিহ্নের কথাতো কখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এই চিহ্ন সাময়িকভাবে দেখা গিয়েছিল এবং পরে তা আর দেখা যায়নি। মাওলানা সাহেবের মতে, একথা যদি সত্যই হয় তাহলেতো আনাছের পক্ষে তা দেখা একেবারেই অসম্ভব। কেননা এ ঘটনার ৪০ বছর পর আনাছের জন্ম হয়েছিল। অন্ততঃ ৫০ বছর পরে যে চিহ্ন দেখতে পেলেন এবং মাত্র ১০ বছর বয়সের বালক আনাছ এতদিন পর সিলাইয়ের চিহ্ন আছে বলে সিদ্ধান্ত করে নিলেন, আজন্ম হযরতের নিকটস্থ কেউই তা দেখতে পাননি, এটি আশ্চর্যের কথা ছাড়া কি হতে পারে?[৭৬] কাজেই মাওলানা সাহেব তাঁর প্রক্ষিপ্ত হাদীসের মাধ্যমেই তাঁর অস্বীকারত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

রাসূল করীমের ওহীর যথার্থতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একদল প্রতিপক্ষ আরো বলেন, যে হযরত শৈশবে মৃগী বা মূর্ছা রোগে পীড়িত ছিলেন। হালিমা গৃহে অবস্থানকালে তিনি সময় সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন এবং এই রোগের বিকারেই মনে করতেন যে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে বাণী বা ওহী হয়ে থাকেন। মাওলানা সাহেব তাঁর মোস্তফা চরিতে খ্রিস্টান লেখকের এসব বর্ণনার অসারতা প্রমাণ করেন। এসব লেখকের মতবাদকে তিনি ইতিহাস ও যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে যাচাই করেন। W. Muir এর বক্তব্য– 'হেশামী এবং তাঁর পরবর্তী লেখকগণ বলেন– অবস্থা দর্শনে হালিমার স্বামী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বালকটি (মোহাম্মদ) 'had a fit' 'উমিবা' বা মুর্ছা গিয়েছিল।'[৭৭] খণ্ডন করে তিনি বলেন ঃ

১. হেশামী বা তাঁর পরবর্তী কোন লেখকই বলেননি যে, 'বালক মুর্ছাগ্রস্থ হয়েছিল।' হালিমার স্বামী এ কথা কোথাও ঘুনাক্ষরেও উল্লেখ করেননি।

২. ইউরোপ ও মিসরের মুদ্রিত হেশামী পুস্তকের কোথাও 'উমিবা' নেই, সবস্থানে 'উছিবা' আছে।

৩. 'উছিবা' শব্দের অর্থ 'ভুত-প্রেত কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছে'।

৪. হালিমার স্বামীর কথায় জানা যায় যে, 'হযরত ভূতাবিষ্ট হয়েছিলেন'। তিনি আশংকা করে বলেছিলেন যে, 'হে হালিমা। আমার ভয় হচ্ছে যে, বালক (মোহাম্মদ) হয়তো ভূতাবিষ্ট হয়েছে।'

৫. হেশামী এই কথাও উল্লেখ করেছেন যে, হালিমা হযরতকে নিয়ে আমেনার কাছে এসে এ কথা বললে আমেনা বললেন– 'তুমি কি ভয় করছো যে তাঁর উপর শয়তানের প্রভাব হয়েছে? অসম্ভব। তা কখনও হতে পারে না। তাঁর মধ্যে একটি মহত্বের ভাব বিদ্যমান আছে।'

৬. হেশামীর পরবর্তী লেখকগণ এ ঘটনার বিবরণ প্রদান করেছেন এভাবে– 'হালিমা বলতেছেন– তাঁর স্বামী বললেন, এ বালকটির 'নজর লেগেছে', অথবা এদিকে ওদিকে ঘুরেবেড়ায় এরূপ কোন জেনে পেয়েছে।' অতএব তাঁকে আমাদের গুণীজনের নিকট নিয়ে যাও, তাঁরা দেখে শুনে তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন।'

৭. W. Muir তার বইয়ের নতুন সংস্করণে অনেকটা আমতা আমতা করে বলেছেন, 'It was probably a fit of Epilepsy, (সম্ভবতঃ ওটা মৃগী রোগ জনিত মুর্ছা)।'[৭৮] এ অনুমান যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাতে সন্দেহ নেই।

মাওলানার বর্ণনা হতে জানা যায় যে, W. Muir সহ অন্যান্য লেখকগণ হযরতের খৎনার ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন। তাদের মতে, হযরত 'মাখতুন' বা 'ত্বক-ছেদকৃত' অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁ তাদের এই মতকে একবাক্যে মিথ্যা ও অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা হযরত মাতৃগর্ভ হতে 'মাখতুন' অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন এ বিবরণটি যে সহীহ নয়, মুসলমান ঐতিহাসিক ও আলেমগণ তা প্রতিপন্ন করেছেন। এমন কি হযরতের জন্মের সপ্তম দিবসে আব্দুল মোত্তালিব যে যথানিয়মে তাঁর খৎনা করেছেন, হাদীসে ও ইতিহাসে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। একারণেই মুসলমান লেখকগণ এবিষয়ে কোনই বাড়াবাড়ি করেননি। অবশ্য মাওলানা আকরম খাঁ মুরের এ অবস্থাকে অস্বাভাবিকও বলেননি। কেননা আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যাদের খৎনা করার প্রয়োজন হয় না, এটাকে আমাদের দেশের মুসলমানেরা 'খোদাই খৎনা' বলে থাকেন।[৭৯] তবে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খৎনা করা হয়েছিল, তাঁর

দাদা আব্দুল মোত্তালিবের বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। মোস্তফা চরিতে এর যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে।

পিতৃব্য আবু তালেবের সাথে ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া যাওয়া ও পথিমধ্যে বাহিরা নামক একজন পাদরীর নবী (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাকে মাওলানা সাহেব অসার ও অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন। বিশেষ করে নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপার যেমন– হযরতকে বক্ষ প্রস্তরাদির সিজদা করা, তাঁর উপর মেঘের ছায়াপাত, হযরতকে ছায়া দানের জন্য বৃক্ষ-ছায়ার করা, তাঁর উপর মেঘের ছায়াপাত, হযরতকে ছায়া দানের জন্য বৃক্ষ-ছায়ার সরে আসা ইত্যাদিকে তিনি অযৌক্তিক বলে মনে করেন। এ হাদীসটি একটু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে প্রায় সমস্ত 'চরিত-পুস্তকে' স্থান পেয়েছে। এমনকি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবীতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মাওলানা সাহেব যে সব কারণে এ বর্ণনাকেও অস্বীকার করেন, সেগুলো যাচাই করলে এর সত্যাসত্য পাওয়া যাবে। যেমন–

১. বিশেষত যে আবু তালেব পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের আবদার অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি নিমন্ত্রণ ভোজরে সময় হযরতকে উটের আস্তাবলে ছাড়িয়া গেলেন।

২. ইহূদী ইহাকে 'শেষ নবী' বলিয়া চিনিতে পারিবে এবং তাঁহাকে হিংসাবশতঃ হত্যা করিয়া ফেলিবে।

৩. আবু তালেব শীঘ্র-শীঘ্র নিজের কাম কাজ শেষ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া গেলেন।

৪. কিন্তু এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাহিরার উপদেশ মতে আবু তালেব হযরতকে অবিলম্বে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।[৮০]

এ সমস্ত মতের একটার সঙ্গে অপর বর্ণনার কোনো সামঞ্জস্য নেই। মাওলানা সাহেব এসব কথার জবাবে বলেন ঃ

১. তিরমিযি ও মোস্তাদবাকের বর্ণিত হাদীসে ইহূদীর পরিবর্তে খ্রীষ্টানের কথা বলা হয়েছে।

২. সর্ববাদী সম্মতরূপে তখন আবু বকর (রাঃ) দশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। অধিকন্তু এ ঘটনার সময় বেলালের জন্মই হয়নি। পক্ষান্তরে আবু বকর সে এই যাত্রায় হযরতের সঙ্গে ছিলেন না, ইতিহাসে ও হাদীসের রেওয়ায়েতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এদিকে বেলালের সহিত আবু বকরের সংশ্রব হয়– উভয়ের ইসলাম গ্রহণের পর। যে হাদীছে এবং যে রাবীর হাদীসে এহেন নির্ভাজ মিথ্যা কথা সন্নিবেশিত থাকে, সে রাবীর সাক্ষ্য বা ঐ প্রকার হাদীস সর্বতোভবে বাতিল ও অগ্রাহ্য। সুতরাং উহা প্রমাণস্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।"[৮১] এই হাদীসে "আরও কথিত হইয়াছে যে, হযরত ও তাঁহার স্বজনগণ মক্কা হইতে বাহির

হওয়ার পর হইতে এবং বাহিরার মঠ সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এমন একখানা প্রস্তর অথবা এমন একটি বৃক্ষ ছিল না, যাহা হযরতকে ছিজদা করার জন্য ভূপাতিত হয় নাই। কিন্তু হযরত ইহা দেখিলেন না, আবু তালেব বা অন্য কোন কোরেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না, দুনিয়ার আর একটি প্রাণীও দেখিতে পাইল না, তাহা দেখিলেন বহুদূরে অবস্থিত বাহিরা রাহেব তাহার মঠের কোণে বসিয়া। ইহা অপেক্ষা আজগুবী কথা আর কি হইতে পারে? ইহা ব্যতীত বৃক্ষও প্রস্তরের পক্ষে হযরতকে ছেজদা করা এবং ছেজদা করার জন্য ভূপাতিত হওয়া যথাক্রমে এছলামের মূল শিক্ষা এবং নিজ প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা।"[৮২] মাওলানা আকরম খাঁ এরূপ তথ্য নির্ভর প্রমাণের মাধ্যমেই বাহিরা পাদরীর এই কল্পিত কথাকে অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করেছেন।

প্রায় সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে বিবাহের কথা উল্লেখ আছে, বিশেষ করে এবনে খালদুন, এবনুল ফারেছ, হালবী, মোছলেম, কানজুল ওম্মাল, দারেমী, মাওয়াহেব প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। মোস্ত ফা চরিত পুস্তকে নির্ভরযাগ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে এর বিশদ কাহিনী। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) গুণ-গরিমা অবগত হয়ে সাধ্বী খাদিজা পূর্ব হতেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হযরতকে ব্যবসার জন্য পাঠিয়ে অধিক লাভ, তাঁর চরিত্রমাধুর্য আর অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে খাদিজার পবিত্র প্রেম ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ফলে তিনি তাঁর সহধর্মিনী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছিলেন অবিবাহিত, ২৫ বছর বয়স্ক তরুণ যুবক, আর খাদিজা ছিলেন চল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলা এবং বিধবা। তাঁর রূপ-গুণ বিশেষতঃ তাঁর ধন-সম্পদের জন্য কোরেশ প্রধানদের অনেকেই তাঁকে পয়গাম দিয়েছিলেন, কিন্তু খাদিজা এসব প্রস্তাবকে পাত্তা না দিয়ে চুপছিলেন।

অথচ হযরতের চরিত্র মাধুর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে খাদিজার মন আজ আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বেলিত। এমনই এক পর্যায়ে বিবি খাদিজা তাঁর সহচরী নাফিছাকে বিয়ের পয়গামসহ সৎ সাহস নিয়ে হযরতের কাছে তাঁর মত জানার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বিবি নাফিছা এ সম্পর্কে নিজেই বলেন ঃ "আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন? হযরত বলিলেন, বিবাহ করিবার মত সম্বল আমার নেই, কি করিয়া বিবাহ করিব! আমি বলিলাম, তাহার সু-ব্যবস্থা যদি হইয়া যায়? মনে করুন, এমন কোন মহিলা যদি আপনার সহধর্মিনী হইতে চান, যিনি ধনে-মানে, কুলে-শীলে এবং স্বভাব-চরিত্রে অতুলনীয়। তাহা হইলে আপনি কি তদ্রূপ বিবাহে সম্মত হইবেন? হযরত বলিলেন, তিনি কে তাহা শুনিতে পারি কি? তখন আমি খাদিজার নাম করিলাম। হযরত আমার কথা শুনিয়া বলিলেন-- সে কথা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন? আমি বলিলাম-- আমি বলিতেছি এবং আমি ইহা করিয়াও দিব।"[৮৩] এ কথোপকথনের পর নাফিছা চলে গিয়ে খাদিজার কাছে

নিজের সফলতার সংবাদ দিলেন। এদিকে হযরতও চাচা আবু তালেবকে এ বিষয়ে অবগত করানোর পর বিবাহের যাবতীয় কার্যের আয়োজন শেষে বিবাহ্ সম্পাদন হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, এ বিবাহে খাদিজার আত্মীয় স্বজন ও হযরতের পক্ষে স্বীয় চাচা আবু তালেব ও আমীর হামজা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন।[৮৪]

মাওলানা আকরম খাঁ মোস্তফার পবিত্র চরিত্রে যাতে কোন প্রকার কলংকের দাগ কেউ দিতে না পারে এবং কোন কালের লোক যেনো এ ব্যাপারে কোন ভ্রান্তি তে পতিত না হয়, সে জন্য মোস্তফা-চরিত-এ আরও কতিপয় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিবি খাদিজার বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে এক শ্রেণীর কথক যুক্তি ও ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করে একটি অতি ঘৃণিত বিবরণ প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলার হীনমানসে কতকগুলো অসত্য কথাকে ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ 'বিবি খাদিজার পিতা খোওয়ালেদ এই বিবাহে আদৌ সম্মত ছিলেন না। তাই খাদিজা তাঁকে বেদম মদ পানি করিয়ে মাতাল করে ফেলেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় তিনি এই বিবাহের কার্য সম্পাদন করেন। জ্ঞান ফিরে এলে খোওয়ালেদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং এক পর্যায়ে বর ও কন্যার বংশের মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়ে পড়লো।' এ সমস্ত পুস্তকের কোনো কোনোগুলোতে একথাও উল্লেখ আছে যে, বিবাহের পূর্বে বিবি খাদিজা একদিন হযরতের হাত ধরে তাঁকে নিজের বুকের ও মুখের উপর টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন। এ সময় বিবি খাদিজা বিবাহের জন্য হযরতকে নানা প্রকার মিনতি জানিয়ে ছিলেন। অথচ এ সমস্ত পুস্তকের মধ্যেই উল্লেখ রয়েছে যে, এই বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কল্পনামাত্র।[৮৫]

ওয়াকেদী নিজেই বলেছেন– "এই সমস্তই ভুল। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার পিতৃব্য ওমর বিন আসাদ তাঁহাকে হযরতের সহিত বিবাহিত করান এবং তাঁহার পিতা ফেজার যুদ্ধের পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।" বলাই বাহুল্য যে, এ সমস্ত বক্তব্য মূলতঃ তাঁরা প্রতিবাদ করার জন্যই নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে অবিশ্বস্ত ও ভিত্তিহীনরূপে উল্লেখ করেছেন।[৮৬]

তিন

মাওলানা আকরম খাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সর্বদা তীক্ষ্ণ। যুক্তিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও তিনি ছিলেন প্রগতিশীল হৃদয়ের অধিকারী। মোস্তফা চরিত তাঁর এমনই একটি রচনা। তিনি ইসলামকে যেমন ধর্ম হিসেবে জানতেন, তেমনি তিনি ইসলামের প্রবর্তক সৃষ্টির সেরা মানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও জানতেন সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে মহান ব্যক্তিত্ব রূপে। মাওলানা আকরম খাঁর ইসলাম নিশ্চল ইসলাম নয়, তা প্রগতিশীল। তাঁর মতে, সকল যুগ, দেশ, স্তর এবং সকল অবস্থায় মানব সমাজের জন্য একটি স্থায়ী, শাশ্বত, স্বর্গীয় এবং আদর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা হলো ইসলাম। সত্যিকার ইসলাম চির সবুজ, চির সরল। আরো পরিস্কার ভাষায় তিনি

যা বলতে চেয়েছিলেন, তা হলো ঃ "যা ইসলাম, তা অচল নয়, আর যা অচল, তা ইসলাম নয়। যে কোন অভিনব সৌন্দর্যের প্রবেশ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। দুনিয়ার যে কোন সমস্যার সমাধান করতে ইসলামের শক্তি সামর্থ্যের অভাব কোন কালে ঘটেনি, কস্মিন কালে ঘটবেও না। কারণ তার জন্য ইজতেহাদের দরজা খোলাই রয়েছে।"[৮৭] মাওলানা আকরম খাঁ এ বৃহৎ গ্রন্থের এক অংশে পীর পুজার বিরুদ্ধে কতিপয় কথা বলে মোস্তফা চরিতকে আরো বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছেন। উল্লেখ্য যে, এতসব প্রয়োজনীয় আলোচনা অন্য কোন জীবন চরিতে এমন যুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে স্থান পায়নি। কিন্তু মাওলানা সাহেব 'মানব মুক্তির দিশারীর জীবন চরিত' রচনায় এগুলোর প্রয়োজন মনে করে আলোকপাত করেছেন। পীর পূজা সম্পর্কে তার মনোভাব ছিলো কঠোর। মাওলানা সাহেব ছিলেন পীর পূজার দুশমন। এদেশে পীরদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা কতবড় কঠিন কাজ, তা সহজেই বুঝা যায়। তিনি দেখলেন একদল সাদাসিদে লোক পীর-সন্নাসীদের খপ্পরে পড়ে তাদের শিক্ষা অনুসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করছে এবং সংসার বিমুখ হয়ে আপন কর্তব্য কাজের প্রতি অবহেলা করছে। তারা ইস্ট লাভ ও অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পীরদের শরনাপন্ন হচ্ছে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো উদ্দেশ্য পুরো করতে পারে না। তাই মাওলানা সাহেব কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কটাক্ষ দৃষ্টি উপেক্ষা করে পীর-পুরোহিত পূজার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তিনি বলেন ঃ "ইস্ট লাভ বা অনিষ্ট নিবারণের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে গায়রুল্লাহর শরণ গ্রহণ আজ আমাদের সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত। ইহার প্রতিবাদ করতে গেলে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতে হয়। অথচ আমরা অনেকেই জানি যে, এই সব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মুলোৎপাটন করাই হইতেছে ইসলামের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।[৮৮] মাওলানা সাহেব ছিলেন অন্ধ অনুকরণের দুশমন এবং ইজতেহাদের প্রবক্তা। তিনি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেন এবং বলেন যে, দেশের চাপ, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্ব সূরীদের মতের অন্ধ অনুকরণে মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাধারা বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে। তখন মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে দাসত্বের এ লানত থেকে মুক্ত করা ইসলাম আপন পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। আধুনিক জীবনের সাথে ইসলামী জীবনধারার সমন্বয় সাধন করাই ছিল মাওলানা সাহেবের ইজতিহাদের চরম ও পরম লক্ষ্য।[৮৯]

মহানবী (সাঃ)-এর জন্ম থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত এই ৬৩ বছর বয়সের যাবতীয় ঘটনাকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তারপরও বিভিন্ন লেখক তাঁদের সাধ্যমত জীবনীগ্রন্থ রচনা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁও সে সব লেখকদের মধ্যে একজন এবং তাঁর *মোস্তফা চরিত* ও এসব জীবনী গ্রন্থের মধ্যে একটি। কিন্তু *মোস্তফা চরিত* অন্যসব জীবনী গ্রন্থের চেয়ে স্বতন্ত্র। এই পুস্তকে হযরতের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে নিঁখুত ও বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোকে যাচাইয়ের মাধ্যমে আলাচনা করা হয়েছে। *মোস্তফা চরিত* মাওলানা আকরম খাঁর দীর্ঘ সাধানার ফসল। ইহা ব্যতিক্রমধর্মী একটি বৃহৎ সীরাত সাহিত্য।

এখানে সঠিক ইতিহাস ও সত্য-তথ্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে শিল্পের আঙ্গিকে। তবে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ভুল-ত্রুটি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন এবং তাঁর মোস্তফা চরিত গ্রন্থটিও সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং ষোলকলায় পরিপূর্ণ একথা হয়তো নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কিছুটা সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়ভুক্ত একজন 'লা-মাযহাবী' পন্ডিত। আর তাই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'-এর মতকে বর্জন ও দুর্বল করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। মোস্তফা চরিত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এর প্রমাণ মাওলানার বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়তঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহর বর্ণনা মতে মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন একজন যুক্তিবাদী পণ্ডিত। সব কিছুকে তিনি যুক্তির আলোকেই বিচার করতেন। তাই জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসকে বুঝবার প্রয়াস তিনি পেয়েছেন।[৯০] কাল্পনিক, অলৌকিক ও দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত অতিরঞ্জিত ঘটনাসমূহকে তিনি যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে যা সত্য মনে করেছেন, তা-ই এ গ্রন্থে তিনি স্থান দিয়েছেন।[৯১] তা ছাড়া যে হাদীসসমূহ ইমামদের মতে নিখুঁত বলে প্রমাণিত ও পরিগণিত, বিজ্ঞান ও যুক্তির মাপ কাঠিতে তিনি এর সত্যাসত্য নিরূপণের ও প্রয়াস চালান।[৯২] সম্ভবত এতটুকু বাড়াবাড়ি না করে বরং কিছুটা নমনীয় পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় ছিল।

তৃতীয়তঃ মাওলানা আকরম খাঁ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনী রচয়িতাদের অবলম্বনকৃত পন্থা ও নিয়ম-নীতিকে ভুল ও ভিত্তিহীন মনে করে সম্পূর্ণরূপে তা বর্জন করেছেন এবং নিজের অবলম্বনকৃত পন্থা ও নিয়ম নীতিকেই নির্ভুল হিসেবে মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়– "হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী রচনা– ব্যাপারে অন্যান্য লেখকগণ এ যাবৎ সাধারণতঃ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পুর্ণ রূপে বর্জন করিয়াছি।"[৯৩] তাছাড়া স্যার সৈয়দ আহমদের খুতবাতে আহমদিয়া এবং আল্লামা শিবলী নোমানীর সীরাতুন্নবী (সাঃ) গ্রন্থদ্বয়সহ অন্যান্য সীরাত গ্রন্থসমূহের দোষত্রুটি তিনি অবলীলাক্রমে উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। এমনকি জমহুর উলামা কর্তৃক বর্ণিত বহু বর্ণনাকে তিনি ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করেছেন।

চতুর্থঃ তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর রচিত মোস্ত ফা-চরিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্যসব জীবনী গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন উপকথা, গাল-গল্প ও বাজেকথায় ভরপুর। তাঁর ভাষায়– "তাঁহার (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) জীবনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে যে সকল বহি-পুস্তক পরবর্তীকালে লিখিত হয়েছে, তাহার অধিকাংশই সত্য-মিথ্যা, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য প্রকৃত ও প্রক্ষিপ্ত রেওয়ায়েৎসমূহ পরিপূর্ণ।"[৯৪] এ ধরণের বক্তব্য একজন ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তিকে কিছুটা হলেও ক্ষুন্ন করে।[৯৫]

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. এ.এইচ এম মুজতবা হোসাইন, *মওলানা আকরম খাঁঃ সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান* (সংকলন ঃ সীরাতুন্নবী (সাঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) পৃঃ ১২০।

২. আবদুল ওহাব সিদ্দিকী, "মহান স্মৃতি", আবু জাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত), *মাওলানা আকরম খাঁ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর- ১৯৮৬, পৃঃ ৩১৯।

৩. Perween Hasan and Mufakharul Islam (ed.) *Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar,* Centre of Advanced Research in Humanities, Dhaka University, Dhaka, 1999, P. 367.

৪. Abu Jafar, *Maulana Akram Khan: A Versatile Genius,* (Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka 1984) p. 20.

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক,* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০) পৃঃ ৪১৩।

৬. ঐ. পৃ. ৪১৩।

৭. এ.টি.এম আতীকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ১৯৯৫, পৃঃ ১।

৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত,* (ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ জুন- ২০০০) পৃ. ৬।

৯. ঐ, পৃঃ ৬।

১০. ড. মুহাম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, *বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৯০।

১১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা চরিত,* পূর্বোক্ত, পৃঃ নিবেদন অংশ, ১ম পরিচ্ছেদ।

১২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃ. ৪১৩।

১৩. মুজীবুর রহমান খাঁ, *এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা,* (মাওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা- ১৯৮৬) পৃঃ ১১৬।

১৪. ঐ. পৃঃ ১১৭।

১৫. আবুল হাশিম, *মাওলানা আকরম খাঁ,* (মাওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬) পৃঃ ৩১৫।

১৬. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *মাওলানা আকরম খাঁ* স্মরণে (মাওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬) পৃঃ ১৩০।

১৭. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ৩২৬।
১৮. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।
১৯. ড. আনিসুজ্জামান, *সাহিত্যিক ও সাংবাদিক*, (মাওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬) পৃঃ ১৭৫-১৭৬।
২০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৫।
২১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৫।
২২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৫।
২৩. ঐ, পৃঃ ৪১৫।
২৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৬।
২৫. এ. এইচ, এম মুজতবা হোসাইন, *মাওলানা আকরম খাঁঃ সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান*, (সীরাত সংকলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) পৃঃ ১২৫।
২৬. এ.এইচ. এম মুজতবা হোসাইন, পৃঃ ১২৫।
২৭. ঐ, পৃঃ ১২৫, ১২৬।
২৮. ঐ, পৃঃ ১২৬।
২৯. ঐ, পৃঃ ১২৫।
৩০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃ. ১।
৩১. ঐ, পৃঃ ১, ২।
৩২. ঐ, পৃঃ ৩।
৩৩. ঐ, পৃঃ ৩, ৪।
৩৪. ঐ, পৃঃ ২১, ২২।
৩৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ঐ. পৃঃ ৩৪-৪৬।
৩৬. ঐ, পৃঃ ৫১, ৫২।
৩৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯০।
৩৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১১।
৩৯. ঐ, পৃঃ ১১২ (উদ্ধৃত)।
৪০. ঐ, পৃঃ ১১২-১১৩।
৪১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪১৪।
৪২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃঃ ২০০-২০১।
৪৩. গোলাম মোস্তফা, *'বিশ্বনবী'*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা- ১৯৯৮, পৃঃ ২৯০, (সংগ্রহ- তফসীরে হক্কানী, পৃঃ ২১১-২১২।
৪৪. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃ, ২৯০।

৪৫. *আল-কুরআন*, ২-১২৭, উদ্ধৃত, গোলাম মোস্তফা, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৯০-৯১।
৪৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৯।
৪৭. ঐ, পৃঃ ১৫১।
৪৮. ঐ, পৃঃ ১৫১।
৪৯. ঐ, পৃঃ ১৫১-৫২।
৫০. ঐ, পৃঃ ১৫২।
৫১. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃঃ ২৮৩।
৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৪, ১৮৭, ২৮৮।
৫৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২।
৫৪. ঐ, পৃঃ ১৫৩।
৫৫. গোলাম মোস্তফা, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৫০।
৫৬. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, পৃঃ ৪১৪।
৫৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, পৃঃ ১৫৫, ১৫৬ (কোরআন, ২৬ পারা, ১৩, রুকু)
৫৮. ঐ. পৃঃ ২৯০।
৫৯. গোলাম মোস্তফা, পূর্বোক্ত পৃ, ৩০০।
৬০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৮।
৬১. গোলাম মোস্তফা, পূর্বোক্ত পৃ, ৩৩৫।
৬২. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৫।
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৬-৩৭।
৬৪. *আল-কুরআন*, ৫ঃ ১৫
৬৫. *আল হাদীস*, উদ্ধৃত, গোলাম মোস্তফা, পৃঃ ৩৩৭।
৬৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃ. ১৫৭।
৬৭. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭।
৬৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৫৭-৫৮।
৬৯. উদ্ধৃত, *মোস্তফা চরিত*, পৃঃ ১৫৮।
৭০. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃঃ ১৫৮।
৭১. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪।
৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫। (মূল মেরকাত, মেশকাতের হাশিয়া, পৃঃ ৫২৪)।
৭৩. ঐ, পৃঃ ১৬৫।

৭৪. ঐ, পৃঃ ১৬৫-৬৬।

৭৫. ঐ, পৃঃ ১৬৬-৬৭।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭।

৭৭. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

৭৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত পৃ. ১৭৬।

৮০. ঐ, পৃঃ ১৭৯-৮০।

৮১. ঐ, পৃঃ ১৮৩।

৮২. ঐ, পৃঃ ১৮৩।

৮৩. ঐ, পৃঃ ১৯২।

৮৪. ঐ, পৃঃ ১৯২, ১৯৯৩।

৮৫. ঐ, পৃঃ ১৯৬।

৮৬. ঐ, পৃঃ ১৯৭।

৮৭. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, পৃঃ ৪০৬-৪০৭।

৮৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ৪০৪-৪০৫।

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৭-৪০৮।

৯০. আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, "বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান" অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাঃ বিঃ ১৯৯৭, পৃঃ ১৬৪।

৯১. ঐ, পৃঃ ১৬০।

৯২. এ.এইচ.এম. মুজতবা হোসাইন, পৃঃ ১১৫।

৯৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, নিবেদন অংশ, ১ম পরিচ্ছেদ।

৯৪. ঐ, পৃঃ ৩।

৯৫. প্রবন্ধখানা গত ২৫ জুলাই, ২০০১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধকার কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে এবং বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দের আলোচনা-সমালোচনার আলোকে এবং Reviewer এর মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে (প্রবন্ধকার)।